সমকাল

তারিখ ..15 DEC 2016.....
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...১-৫.....



# আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও আন্তর্জাতি

## বিজয়ের মাস | নুরুল ইসলাম নাহিদ

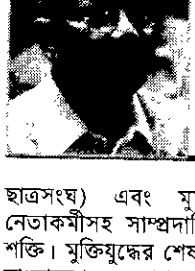



| শিক্ষামন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকার

ডিসেম্বর মাস আমাদের জাতির বিজয়ের মাস। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, সামরিক বাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বিশ্বের বুকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা-বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের মহানায়ক হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আমাদের 'মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা-বাংলাদেশ-বঙ্গবন্ধু' এই শব্দগুলো অবিচ্ছেদ্য। এগুলোকে সমার্থকও বলা যেতে পারে। আমাদের জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা প্রদান করেন। আমাদের বীর জনগণ সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণকারী সশস্ত্র পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছে। এক কোটি মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ নানাভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত, ক্ষতিগ্রস্ত, লুণ্ঠিত, অত্যাচারিত হয়েছে। মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম সব হারিয়ে লড়াই চালিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় পতাকা উঁড়িয়ে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করেছে।

পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যের অবসান, গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন, জাতীয় অধিকার, শিক্ষার জন্য সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পক্ষে জনগণের অভূতপূর্ব রায় প্রদান এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সে রায় অনুসারে বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা দিয়ে আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে না দিয়ে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া-ভুট্টো মিলে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করেন। নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ৩ মার্চ আহ্বান করলেও ১ মার্চ তা স্থগিত করে দেন। তাৎক্ষণিক বাংলাদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজপথে নেমে আসে স্বাধীনতার স্লোগান নিয়ে। বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক পূর্বাণী হোটেলে আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির চলমান সভা শেষে সংবাদ সম্মেলন করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু যেসব দিকনির্দেশনা ও কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, সে অনুসারে ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেশব্যাপী চলে চূড়ান্ত প্রস্তুতি।

ষাটের দশকে সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শিক্ষানীতির জন্য সংগ্রাম, সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু উত্থাপিত ৬ দফার সংগ্রাম এবং '৬৯-এ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার (যার মধ্যে ৬ দফা দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ১ নম্বর দাবি ছিল শিক্ষার দাবি) ভিত্তিতে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা) প্রত্যাহারের ফলে বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে জাগ্রত করেন, সচেতন করেন। ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হন।

একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশে তৎকালীন জটিল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন করণীয় নির্ধারণ, স্বাধীনতার প্রস্তুতি ও সংগ্রামের নির্দেশনা দেন। ইতিহাসের এই অতুলনীয় ভাষণে তিনি ঘোষণা দেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এটাই ছিল স্বাধীনতার প্রকৃত ঘোষণা। ২৬ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত অধিকাংশ সদস্যের নেতা (প্রধানমন্ত্রী, যা সামরিক শাসকরা হতে দেয়নি) হিসেবে বৈধভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। জনগণের রায়ের ফলে যা আনুষ্ঠানিকভাবে বৈধতা লাভ করেছিল। ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ঐক্যবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে বন্দি করে রাখে। তাকে তারা হত্যার চেষ্টা করেও আন্তর্জাতিক চাপের কারণে তা করতে সক্ষম হয়নি। বঙ্গবন্ধু বন্দি থাকায় আমাদের স্বাধীনতা ও বিজয় ছিল অসম্পূর্ণ। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসকরা তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় এবং তিনি ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নস্যাৎ করে পরাধীন করে রাখার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের আন্তর্জাতিক সহযোগী শক্তির সমর্থনে ও বিশেষ করে বাংলাদেশের একটি বিশেষ মহল সব ধরনের হত্যা, লুট, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, মা-বোনের ইজ্জত লুটে নেওয়ার সঙ্গে সর্বাধিক সক্রিয় ছিল। এদের মধ্যে প্রধান শক্তি ছিল জামায়াতে ইসলামী ও তার সহযোগী ইসলামী ছাত্রশিবির (তখন নাম ছিল ইসলামী ছাত্রসংঘ) এবং মুসলিম লীগের অধিকাংশ নেতাকর্মীসহ সাম্প্রদায়িক, স্বাধীনতাবিরোধী কিছু শক্তি। মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির পরিকল্পিতভাবে আমাদের বুদ্ধিজীবী শিক্ষক ও সব ধরনের মেধাবীদের হত্যা করেছিল। এসব অপরাধীর অনেকের বিচার হয়েছে এবং মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এখনও চলছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে পরাজিত করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে গণচীনও পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সব ধরনের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল আমাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তারা এক কোটি মানুষকে আশ্রয় ও সেবা দিয়েছিল। ভারত সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ, সমর্থন ও সাহায্য করেছিল। বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে সম্ভব সবকিছুই করেছিল। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে সব সাধারণ মানুষ, কংগ্রেস পার্টি, সিপিআইসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থেকে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন।

আন্তর্জাতিকভাবে আরেকটি বড় উপাদান ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবস্থান নিয়ে সরাসরি আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন ও সাহায্য না করলে পরিস্থিতি আরও জটিল, দীর্ঘসূত্রী ও বিপজ্জনক হতে পারত। ১৯৭১-এর ২৯ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে একটি পত্র লিখে গণহত্যা বন্ধ করতে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। চিঠিতে তিনি বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে লিখেছিলেন। জাতিসংঘে পাকিস্তান ও আমেরিকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান, বঙ্গোপসাগরে পাঠানো মার্কিন সপ্তম নৌবহর ফিরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ সুগম করেছিল।

আমরা আন্তর্জাতিক জনমত, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। বিপদের সময়ের বন্ধুদের আমরা ভুলে যেতে পারি না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ষাটের দশকের শুরু থেকে ছাত্র আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে সব সংগ্রামে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার ফলে একজন সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে লড়াই করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তৎকালীন অন্যতম বৃহৎ ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে পৃথক গেরিলা বাহিনী গঠন করার জন্য ভারত সরকারের সব সাহায্য আদায় ও কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছিলাম।



বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে পরাজিত করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে গণচীনও পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সব ধরনের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল আমাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তারা এক কোটি মানুষকে আশ্রয় ও সেবা দিয়েছিল। ভারত সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ, সমর্থন ও সাহায্য করেছিল। বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে সম্ভব সবকিছুই করেছিল

আমি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ডিপি ধর, পিএন হাকসার যারা ভারতের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে দায়িত্বে ছিলেন, আমাকে সন্তানতুল্য স্নেহ ও সাহায্য করেছিলেন।

'৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিস্লাভায় (তখন চেক্ ও স্লোভাকিয়া এক রাষ্ট্র ছিল) আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের (International Union of Students-IUS) দশম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আমন্ত্রণ পেয়ে যোগদান করতে গিয়েছিলাম। এর আগে অনুমতি না পাওয়ার কারণে পাকিস্তান থেকে কোনো ছাত্রনেতা আন্তর্জাতিক কোনো ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করার সুযোগ পাননি। আন্দোলনের চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার শেষ মুহূর্তে আমাকে এক মাসের জন্য পাসপোর্ট দিতে বাধ্য হয় (কেবল চেকোস্লাভিয়া যাওয়ার জন্য)। এ সুযোগ গ্রহণ করে গোপনে আমি যাতায়াতের পথে ৯ দিন মস্কোতে থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করার সুযোগ গ্রহণ করি। এ ঘটনা তখন কেবল বঙ্গবন্ধু এবং সিপিবি নেতা কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ জানতেন। সেভাবে তারা ব্যবস্থা করেছিলেন। এ দু'জনের বাইরে আর কেউ জানতেন কি-না তা আমি জানি না বা কখনও জানতে চাইনি। আমি তখন বয়স ও অভিজ্ঞতায় অনেক ছোট। কিন্তু সোভিয়েতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা আমার আবেগ ও বাস্তব অবস্থার বর্ণনা, জনগণের মতামত, দৃঢ়তা, বিভিন্ন সংগ্রামে তাদের অবস্থান, অতীতের বিভিন্ন ঘটনা ছাত্র-



বুধবার 'স্মৃতিতে রায়ে
টাউন থিয়েটার